ইউনিট

১০ খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কী সালতানাতের অবসান ঘটে। এরপর শুরু হয় খলজী বংশের শাসন। খলজীগণ ভারতে আসার আগে দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে বসবাস করে। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাদেরকে পাঠান বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন তুর্কী। জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী ছিলেন এই বংশের প্রথম সুলতান। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির শাসক। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন খলজী সুলতান হন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ও শক্তিশালী শাসক। খলজী বংশের সকল গৌরব বস্তুত: আলাউদ্দীনেরই প্রাপ্য। রাজ্য বিস্তার, সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আলাউদ্দীন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখেন। খলজী বংশ মোট ত্রিশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তার মধ্যে বিশ বছরই শাসন করেন আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)। আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সাম্রাজ্য কিংবা শাসনব্যবস্থা কোনটাই ধরে রাখতে পারেননি। ফলে আমীরগণ আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেন। খলজী বংশের পর তুঘলক বংশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

পাঠ ১

জালালউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রি:)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জালালউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- জালালউদ্দীনের নিহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জালালউদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে করবেন।

খলজীদের ক্ষমতারোহণ

বলবনের পর তাঁর পৌত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান হন। যৌবনকাল পর্যন্ত তাঁকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে লালন-পালন করা হয়েছিল। সুলতান হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। আমীরগণ তখন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র কায়মুরসকে সুলতান করা হয়। কায়মুরসের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। এই সময় খলজী মালিকগণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। খলজীগণ তুর্কিস্তানের লোক। তুর্কিস্তান থেকে এসে তারা দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে বসবাস করে। সেখান থেকে আসে ভারতে। আফগানিস্তান থেকে আসার কারণে জিয়াউদ্দীন বারণী প্রমুখ ঐতিহাসিক তাদেরকে আফগান বলেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন তুর্কী। খলজী মালিকগণ কায়মুরসকে সরিয়ে জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজীকে সিংহাসনে বসান।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

জালালউদ্দীন খলজী যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনি বৃদ্ধ। বয়স প্রায় ৭০ বছর। জালালউদ্দীন সিংহাসনে বসায় খলজী ব্যতিত অন্যান্য আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন। তাদের অনেকেই ছিলেন বলবনের বংশধরদের প্রতি অনুরক্ত। তাছাড়া কিছুদিন আগ পর্যন্তও জালাল ছিলেন তাদেরই সমকক্ষ। সুতরাং

হঠাৎ করে সুলতান হয়ে বসায় তারা তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। সেজন্য জালালের অভিষেক পর্যন্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এ অনুষ্ঠান হয় দিল্লীর বাইরে কিলোঘিরি নামক প্রাসাদে। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। জালালউদ্দীন অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর মধুর ও আন্তরিক ব্যবহার শেষ পর্যন্ত দিল্লীর অভিজাতদের মন জয় করে। তখন তাঁর আর দিল্লীতে প্রবেশ করায় কোন অসুবিধা রইলো না।

মোঙ্গল বাহিনীর ভারত আক্রমণ

জালালউদ্দীন সিংহাসনে বসার মাত্র এক বছরের মধ্যে (১২৯১ খ্রিস্টাব্দে) হালাগুখানের পৌত্র আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল বাহিনী ভারত আক্রমণ করে। সুলতান বৃদ্ধ বয়সে সাহস ও দক্ষতার সাথে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। অধিকাংশ মোঙ্গল ভারত ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু উলুঘ খান নামক মোঙ্গল নেতা তাঁর দলবল সহ ভারতে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি চান। সুলতান আনন্দের সাথে এতে রাজি হন। দিল্লীর উপকণ্ঠে তাদের বাস করার জন্য স্থান নির্ধারিত হয়। এ স্থানের নাম দেওয়া হয় মুঘলপুরা। মোঙ্গলগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারা 'নও মুসলিম' নামে পরিচিত হয়।

মালিক চাজ্জুর বিদ্রোহ

জালালউদ্দিনের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে মালিক চাজ্জু বিদ্রোহ করেন। মালিক চাজ্জু ছিলেন বলবনের চাচাত ভাই। তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতান এই বিদ্রোহও সাফল্যের সাথে কাটিয়ে উঠেন। চাজ্জু পরাজিত হন। তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কোমল স্বভাবের জালালউদ্দীন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বিষয়টি খলজী আমীরদের পছন্দ হয়নি। যাহোক, জালালউদ্দীন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনকে কারা প্রদেশের নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারা প্রদেশের সাথে সাথে তাঁকে অযোধ্যা শাসন করার দায়িত্বও দেওয়া হয়। আলাউদ্দীনকে সুলতান অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে লালনপালন করেন এবং তাঁর সাথে নিজ মেয়ের বিয়ে দেন। আলাউদ্দীন সুলতানের অনুমতি নিয়ে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে ভিলসা দখল করেন। জালালউদ্দীনের শাসনামলে রণথম্ভোর দুর্গ পুনরাধিকারের জন্য দুবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এতে সুলতান এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল দুর্গ পুনরাধিকার করার জন্য যে পরিমাণ মানুষ মারা যাবে তাদের জীবনের মূল্য দুর্গের মূল্যের চাইতে অনেক বেশি। সিদি মওলার বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে কিন্তু সুলতান অত্যন্ত কঠোরতার পরিচয় দেন। সিদি মওলা ছিলেন শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই-শেখর -এর শিষ্য। এই সিদিমওলা অন্যান্য আমীরদের সাথে মিলে সুলতানের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। সিদি মওলা বন্দী হন। তাঁকে হত্যা করা হয়।

ভ্রাতুষপুত্র আলাউদ্দীনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন

জালাল উদ্দিনের নিহত হওয়ার ঘটনা

সুলতানের অতিমাত্রায় সরলতা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, ধন-রত্নের প্রতি তাঁর খুবই লোভ ছিল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খলজী সুলতানের কোন অনুমতি না নিয়েই দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্য আক্রমণ করেন। দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র পরাজিত হন। তিনি আলাউদ্দীনকে ৬০০ মণ স্বর্ণ, ১০০০ মণ রৌপ্য, ৭ মণ মুক্তা, ২ মণ হীরা জহরৎ উপঢৌকন দেন। এই বিপুল সম্পদ নিয়ে আলাউদ্দীন কারায় ফিরে এলেন। দাক্ষিণাত্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সাফল্যের সংবাদ শুনে সুলতান অত্যন্ত খুশী হন। তিনি আলাউদ্দীনকে অভিনন্দন জানানোর জন্য নিজেই কারা এলেন। কেউ কেউ বলেন, আলাউদ্দীনের কাছ থেকে উপঢৌকন পাওয়ার লোভও তাঁর ছিল। সুলতান নৌকা থেকে নামা মাত্র আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে তাঁকে হত্যা করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জালালউদ্দীন খিলজী ১২৯০ থেকে ১২৯৬ পর্যন্ত ছয় বছর শাসন করেন। শাসক হিসেবে তিনি তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। তিনি তাঁর পত্নী মালিকা-ই-জাহান ও পুত্র আরকালী খান কর্তৃক প্রভাবিত হতেন। তিনি সবাইকে বিশ্বাস করতেন। তাঁকে স্তোক বাক্যে সহজেই প্রভাবিত করা যেতো। তবে

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী মানুষ। খুব ভাল মানুষ যে সব সময় ভাল শাসক হন না জালালউদ্দীন খলজী তার একটা উদাহরণ।

সার-সংক্ষেপ

কায়কোবাদের পুত্র কায়মুরসকে সিংহাসনচ্যুত করে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালালউদ্দীন খলজী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে তিনি আমীরদের মন জয় করেন। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিছু মোঙ্গলকে তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে বাস করার অনুমতি দেন। এরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং নও মুসলিম নামে পরিচিত হয়। শাসন করার পর সুলতান জালালউদ্দীন খলজী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খলজীর নির্দেশে নিহত হন। সুলতান জালালউদ্দীন খলজী ছিলেন নিরহঙ্কারী ভালো মানুষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। খলজীগণ জাতিগতভাবে–
- ক. তুর্কী।
- খ. পাঠান।
- গ. আরব।
- ঘ. ভারতীয়।

২। জালালউদ্দীনের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়–
- ক. দিল্লীতে।
- খ. লাহোরে।
- গ. দিল্লীর উপকণ্ঠে।
- ঘ. দিল্লীর বাইরে কিলোঘিরি প্রাসাদে।

৩। জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে ভারতে মোঙ্গল আক্রমণের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন–
- ক. চেঙ্গিস খান।
- খ. হালাকু খান।
- গ. আবদুল্লাহ খান।
- ঘ. উলুঘ খান।

৪। আলাউদ্দীনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল–
- ক. কারা প্রদেশের।
- খ. কারা ও অযোধ্যা প্রদেশের।
- গ. অযোধ্যা প্রদেশের।
- ঘ. লাহোর ও মুলতানের।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলজী বংশের ক্ষমতারোহন সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

২. জালালউদ্দীন কিভাবে নিহত হন? তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

পাঠ ২

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কিভাবে আলাউদ্দীন খলজী তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দীন কি কি পদক্ষেপ নেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

আলাউদ্দীন খলজীর ক্ষমতা সুদৃঢ় করনের পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা আলাউদ্দীন খলজীর ক্ষমতা দখল সম্পর্কে জেনেছি। সুলতান জালালউদ্দীনকে হত্যা করার পর তিনি দেখলেন যে তাঁর চারদিকে বিপদ। তিনি বুঝতে পারলেন যে জালালী আমীরগণ সুলতানের হত্যাকারীকে সহজে ক্ষমা করবেন না। তাঁরা প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় খুঁজবেন। জালালউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র আরকালী খান তখন মুলতানে। জালালী আমীরদের সাথে পরামর্শ করে রাজমাতা মালিকা-ই-জাহান তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রুকুনউদ্দীন ইবরাহিমকে সিংহাসনে বসালেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আলাউদ্দীন খলজী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জালালী আমীরদের নিজের দলে টেনে আনার জন্য তাঁদের পদোন্নতি ও অর্থ প্রদানের লোভ দেখালেন। স্বার্থপর আমীরগণ টোপ গিললেন সহজেই। দেবগিরি থেকে আনা অর্থ তিনি অকাতরে আমীরদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বলা যায়, তিনি সোনার মোহর দিয়ে বিরুদ্ধভাবাপন্ন আমীরদের মুখ বন্ধ করলেন। আমীরগণ রুকুনউদ্দীনের পক্ষ ত্যাগ করে চলে এলেন আলাউদ্দীনের পক্ষে। এবার সুলতান আলাউদ্দীন বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করেন। রাজমাতা পুত্রকে নিয়ে মুলতানে পালিয়ে গেলেন। তাঁদের অনুসরণ করার জন্য সুলতান তাঁর ভাই উলুঘখান ও সেনাপতি নসরত খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। আরকালী ও রুকুনউদ্দীন বন্দী হন। মজার ব্যাপার হলো আরকালী ও রুকুনউদ্দীনকে যে সকল আমীর সহায়তা করেছিলেন তিনি তাদের যথেষ্ঠভাবে পুরস্কৃত করেন। আর যাঁরা পদোন্নতি ও অর্থ নিয়ে তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন তিনি তাঁদের কঠোর শাস্তি দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে তারা অর্থ ও পদের লোভে তাঁর বিপক্ষেও চলে যেতে পারেন। যুক্তিসংগতভাবেই সুলতান বললেন, বিশ্বাসঘাতকদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত

অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর সুলতান বাইরের বিপদের দিকে নজর দেন। পূর্ববর্তী সুলতান, এমনকি তারও আগ থেকে ভারতের উপর মোঙ্গলদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালের প্রথম দিকেও মোঙ্গলগণ বার বার ভারতের উপর আক্রমণ চালায়। ১২৯৭ থেকে ১৩০৭ সালের মধ্যে অন্তত: সাতবার মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করেছিল বলে জানা যায়। আলাউদ্দীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবনের নীতি অনুসরণ করেন। বলবনের মতোই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পুরাতন দুর্গগুলো সংস্কার করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। এ সকল দুর্গ রক্ষার জন্য উপযুক্ত, সাহসী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। ১২৯৯ পর্যন্ত লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন জাফর খান। জাফর খান "যুগের রুস্তম" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১২৯৭ ও ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের দুটো মোঙ্গল আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেন। ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের নেতা ছিলেন আমীর দাউদ এবং ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেতা ছিলেন সালদিখান। উভয়ক্ষেত্রেই অভিযানকারীগণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতলুঘ খানের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। মোঙ্গলদের এ অভিযানও ব্যর্থ হয়। এ অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে জাফর খান নিহত হন। এরপর ৪ বছর পর্যন্ত মোঙ্গলগণ ভারতে কোন অভিযান চালায়নি। তবে ১৩০৩ থেকে ১৩০৭ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে। শুধু ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে কোন মোঙ্গল অভিযান হয়নি। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান তুঘলক বংশীয় গাজী মালিককে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মোঙ্গল আক্রমণ যাতে হতে না পারে সেজন্য গাজী মালিক সব সময় তৎপর থাকেন। আলাউদ্দীন দিপালপুর, সামানা ও মুলতানে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে মোঙ্গলদের সর্বশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। ইকবালমন্দ নামক মোঙ্গল সর্দার এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সিন্ধু নদ পার হয়ে তিনি আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। গাজী

মালিক তার গতিরোধ করে দাঁড়ান। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মোঙ্গলদের বহু সৈন্য হতাহত হয়। বেশ কয়েকজন নেতার লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে অবশিষ্ট মোঙ্গলগণ প্রাণ নিয়ে ভারত ত্যাগ করে। স্বয়ং ইকবালমন্দ এ যুদ্ধে নিহত হন। এ চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে মোঙ্গলগণ আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে আর ভারত আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল রক্ষার ব্যবস্থা করেই আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হন নি। বলবনের রক্ষণাত্মক নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। গুজরাট, রণথম্ভোর , চিতোর, মালব ইত্যাদি জয় করে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত তিনি পদানত করেন। উত্তর ভারতের বিজিত অঞ্চল তিনি সরাসরি নিজ শাসনের আওতায় আনেন। এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। দক্ষিণ ভারতে তিনি দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা প্রভৃতি জয় করেন। এ সকল অঞ্চল তিনি সরাসরি শাসনাধীনে আনেন নি। এ সকল রাজ্যের রাজাদের মৌখিক আনুগত্য ও কর প্রদানের শর্তে তিনি তাদের রাজ্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। আগামী পাঠগুলোতে একে একে তাঁর রাজ্য জয়, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

বলবনের রক্ষণাত্মক নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন

সার-সংক্ষেপ

জালালউদ্দীনকে হত্যা করে আলাউদ্দীন সিংহাসনে বসেন। জালালউদ্দীনের পুত্র আরকালী ও রুকুনউদ্দীনকে বন্দী করা হয়। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গগুলো তিনি সুরক্ষিত করেন। বহু পুরাতন দুর্গ সংস্কার ও নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সেনাপতি জাফর খানের বীরত্বের জন্য মোঙ্গলগণ ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। জাফর খানের মৃত্যুর পর গাজী মালিক লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিও সাফল্যের সাথে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। শেষবার মোঙ্গল নেতা ইকবালমন্দ বিরাট দল নিয়ে ভারতের ভেতরে ঢুকে পড়েন। গাজী মালিকের সাথে যুদ্ধে ইকবালমন্দ পরাজিত ও নিহত হন। বহু মোঙ্গল সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ আর ভারত আক্রমণ করতে সাহস করেনি। আলাউদ্দীন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত নিজের শাসনাধীনে আনেন। দক্ষিণ ভারতের রাজারাও পরাজিত হয়ে তাঁকে কর দিতে বাধ্য হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আলাউদ্দীন খলজী জালালী আমীরদের নিজের পক্ষে নিয়ে এলেন–
ক. পদোন্নতি ও অর্থের লোভ দেখিয়ে।
খ. পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে।
গ. অর্থ প্রদানের লোভ দেখিয়ে।
ঘ. শাস্তি প্রদানের ভয় দেখিয়ে।

২। যে সকল আমীর আরকালী খান ও রুকুনউদ্দীনকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের আলাউদ্দীন–
ক. ফাঁসী দেন।
খ. নির্বাসিত করেন।
গ. পুরস্কৃত করেন।
ঘ. শিরচ্ছেদ করেন।

৩। ১২৯৯ পর্যন্ত লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন–
ক. কুতলুঘ খান।
খ. জাফর খান।
গ. উলুঘ খান।
ঘ. নসরত খান।

৪। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলদের শেষ অভিযাণের নেতৃত্বে ছিলেন–

ক. আমীর দাউদ।
খ. সালদি খান।
গ. কুতলুঘ খান।
ঘ. ইকবালমন্দ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দীন খলজী কিভাবে তাঁর শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় করেছিলেন? সংক্ষেপে লিখুন।
২. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

পাঠ ৩

আলাউদ্দীন খলজীর উত্তর-ভারত বিজয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আলাউদ্দীন খলজীর গুজরাট বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- আলাউদ্দীন খলজীর রণথম্ভোর বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আলাউদ্দীন খলজীর চিতোর বিজয় কাহিনী বর্ণনা এবং পদ্মিনী উপাখ্যান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দীন খলজী

আলাউদ্দীন খলজী একজন অত্যন্ত বড় বিজেতা ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনি নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাম্রাজ্য বিস্তার ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সামরিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করা হয়। জাফর খান, নসরত খান, উলুঘখান প্রমুখ দক্ষ, সাহসী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক নিযুক্ত করা হয়। আলাউদ্দীন খলজীর বিজয় পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি যে কোন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতেন। তবে সিদ্ধান্ত নিতেন নিজে। সিদ্ধান্ত একবার গৃহীত হলে তার আর নড়চড় হতো না।

গুজরাট বিজয়

সিংহাসনে বসার পরপরই সুলতান গুজরাট বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন। গুজরাট ছিল কৃষি ও শিল্পে উন্নত। এখানে প্রচুর ফসল ফলতো। তাছাড়া সুতি ও রেশমি বস্ত্রের জন্য গুজরাট বরাবরই বিখ্যাত। তখন গুজরাটের সুরাট ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলতো। সুতরাং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আলাউদ্দীন খলজী ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে অভিযান প্রেরণ করেন। সুলতানের ভাই উলুঘ খান এবং সেনাপতি নসরত খান এই অভিযান পরিচালনা করেন। বাঘেলা বংশীয় কর্ণদেব ছিলেন গুজরাটের রাজা। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন। কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে কর্ণদেব দেশ থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু রাণী কমলাদেবী বন্দি হন। তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে এলে সুলতান তাঁকে বিয়ে করেন। মুসলিম বাহিনী কাফুর নামক একজন অত্যন্ত সুশ্রী খোজাকেও বন্দী করে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে এই কাফুর সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেন। মালিক কাফুর সুলতানের অন্যতম সেনাপতি হন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে নেতৃত্ব দেন। গুজরাট স্থায়ীভাবে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুজরাটের অপরিমিত সম্পদ সুলতানের হাতে আসে। তাঁর খ্যাতি বহুগুণ বেড়ে যায়।

রণথম্ভোর বিজয়

রণথম্ভোর ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ দুর্গগুলোর অন্যতম। ইলতুতমিসের সময় এই দুর্গ মুসলিম অধিকারে আসে। কিন্তু ইলতুতমিসের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় রাজপুতগণ পুনরায় দুর্গটি দখল করে নেয়। জালালউদ্দীন রণথম্ভোর জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দীন রণথম্ভোর জয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় হাম্বীরদেব ছিলেন রণথম্ভোরের অধিকর্তা। সুলতান গুজরাট বিজেতা উলুঘ খান ও নসরত খানকে ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে রণথম্ভোর জয়ে পাঠান। উভয়ে রণথম্ভোর দুর্গ অবরোধ করেন। নসরত খান অবরোধ পরিচালনার সময় নিহত হন। উলুঘ খানও দুর্গ জয়ে ব্যর্থ হন। তখন সুলতান নিজেই রণথম্বোর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আকাত খান সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আকাত খান ধরা পড়েন এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়। অত:পর সুলতান রণথম্ভোর অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলে। উভয়পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হয়। অবশেষে হাম্বীরদেব পরাজিত ও নিহত হন। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে রণথম্ভোর আলাউদ্দীনের দখলে আসে।

১৩০১ খ্রিস্টাব্দে রণথম্ভোর আলাউদ্দীনের দখলে আসে

চিতোর বিজয়

মেবার ছিল রাজপুতনার অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য। রতনসিংহ ছিলেন মেবারের রাজা। চিতোর ছিল মেবারের রাজধানী। চিতোর দখল না করা পর্যন্ত দিল্লীর কোন শাসকই নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারতেন না। আলাউদ্দীনের পূর্বে কোন সুলতান চিতোর জয়ের সাহস করেন নি। রণথম্ভোর জয়ের দু'বছর পর ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নিজেই চিতোর অভিযানে নেতৃত্ব দেন। মালিক মুহম্মদ জয়সী তাঁর 'পদ্মাবৎ' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন যে রানা রতনসিংহের এক অনিন্দ্য সুন্দরী রাণী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল পদ্মিনী বা পদ্মাবতী। আলাউদ্দীন তাঁর রূপের খ্যাতি শুনে তাঁকে লাভ করার অভিলাষী হয়ে উঠেন। এবং সে জন্যই তিনি চিতোর জয়ের পরিকল্পনা করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ জয়সীর এই কাহিনীকে নেহায়েৎ উপাখ্যান বলে মনে করেন। কবি আমীর খসরু চিতোর অভিযানের সময় সুলতানের সংগী ছিলেন। তিনি তাঁর কোন গ্রন্থে পদ্মিনী সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি। সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থেও এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। কে.এস. লাল প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিক তাই জয়সীর এই কাহিনীর কোন মূল্য দেন না। যাহোক, রানা রতনসিংহ বীরের মতো আলাউদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান। এরপরও গোরা এবং বাদলের নেতৃত্বে রাজপুতগণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। রাজপুত রমণীগণ শত্র*র কবলে* পড়ে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের ইতিহাসে এ প্রথা 'জহরব্রত' নামে পরিচিত। চিতোর সুলতানের দখলে আসে। তিনি নিজ পুত্র খিজির খানের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

মেবার ছিল রাজপুতনার অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য। রতনসিংহ ছিলেন মেবারের রাণা। চিতোর ছিল মেবারের রাজধানী

রাজপুত রমণীগণ শত্রুর কবলে পড়ে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের ইতিহাসে এ প্রথা 'জহরব্রত' নামে পরিচিত

মালব বিজয়

গুজরাট, রণথম্ভোর ও চিতোর বিজয়ের পর মালব জয় ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালবের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। মালবরাজ মাহলকদেব পরাজিত হন। মালবের উজ্জয়িনী, মান্ডু, ধর, চান্দেরী ইত্যাদি ইতিহাসখ্যাত নগর ও দুর্গ সুলতানের করায়ত্ব হয়। সমগ্র মালব আলাউদ্দীন তাঁর সরাসরি শাসনাধীনে আনেন।

এভাবে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত আলাউদ্দীন খলজীর দখলে আসে। সুলতান হওয়ার সময় তিনি যে সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন নিজের চেষ্টায় তা তিনি অনেকখানি বৃদ্ধি করেন। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুলতান তাঁর সরাসরি শাসনাধীনে রাখেন।

সার-সংক্ষেপ

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ছিলেন একজন বড় বিজেতা। তিনি একটি শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলেন। জাফর খান, নসরত খান, উলুঘ খান প্রমুখ কয়েকজন দক্ষ সেনানায়কের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব প্রভৃতি জয় করেন। উত্তর ভারতের এ সকল অঞ্চল জয় করে তিনি সরাসরি নিজের শাসনাধীনে আনেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আলাউদ্দীন গুজরাটের যে রাজাকে পরাজিত করে গুজরাট দখল করেন তাঁর নাম–
   ক. কর্ণদেব।
   খ. মাহলকদেব।
   গ. রতনসিংহ।
   ঘ. হাম্বীরদেব।

২। আলাউদ্দীন খলজী রণথম্ভোর জয় করেন–
   ক. ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে।
   খ. ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে।
   গ. ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে।
   ঘ. ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে।

৩। 'পদ্মাবৎ' কাব্যের রচয়িতা–

ক. আমীর খসরু।
খ. মালিক মুহম্মদ জয়সী।
গ. ফেরদৌসী।
ঘ. আলাওল।

৪। চিতোর জয়ের পর সুলতান শাসনের ভার অর্পণ করেন–
ক. আকাত খানের উপর।
খ. উলুঘ খানের উপর।
গ. নসরত খানের উপর।
ঘ. খিজির খানের উপর।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক গুজরাট বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. আলাউদ্দীন খলজী কিভাবে রণথম্ভোর দুর্গ জয় করেন লিখুন।
৩. আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ৪

আলাউদ্দীন খলজীর দক্ষিণ-ভারত বিজয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আলাউদ্দনি খলজীর দক্ষিণ ভারত বিজয়

উত্তর-ভারত জয়ের পর আলাউদ্দীন খলজী দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারত ইতিহাসের চিরন্তন ধারাটিকেই অনুসরণ করেন। সে ধারা এই যে, আলাউদ্দীন খলজীর আগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সমুদ্রগুপ্তের এবং পরে আকবর ও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এর বিপরীত ধারা ভারতীয় ইতিহাসে লক্ষ করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী যুগে এমন কোন নজির নেই যে, উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের কোন শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য নীতিকে প্রভাবিত করেছে। সুলতান হওয়ার পূর্বে তিনি কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসেবে দেবগিরি আক্রমণ করেন। তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দাক্ষিণাত্যে রয়েছে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অফুরন্ত সম্পদ। তিনি বুঝতে পারেন যে সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাজনৈতিক দিক থেকে অসংগঠিত এবং সামরিক দিকে অত্যন্ত দুর্বল। তাই সুলতান হওয়ার পর দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি এ অঞ্চলের সম্পদের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সেনাপতি মালিক কাফুরে ভূমিকা

দাক্ষিণাত্য বিজয়ে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি ছিলেন মালিক কাফুর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুযোগ সন্ধানী। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালিক কাফুরকে দেবগিরি অভিযানের নির্দেশ দেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র পূর্ব প্রতিশ্রুত করদানে বিরত ছিলেন। তাছাড়া তিনি গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণকে আশ্রয় দিয়ে সুলতানের বিরাগভাজন হন। বিষয়টিকে আলাউদ্দীন খলজী যাদবরাজের সদাশয়তা হিসেবে বিবেচনা করেন নি। বরং একে তিনি যাদবরাজের ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধ হিসেবেই সাব্যস্ত করেন। রামচন্দ্র কাফুরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর আশ্রিত কর্ণদেব পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, কিন্তু দেবলাদেবী ধরা পড়েন। তাঁকে রাজধানীতে এনে মহাসমারোহে যুবরাজ খিজির খানের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। পরাজিত রামচন্দ্র আগের চেয়ে বেশি হারে কর প্রদানের শর্তে রেহাই পান।

দেবগিরি অভিযান

বরঙ্গল অভিযান

১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতানের নির্দেশে মালিক কাফুর বরঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাদব রাজ্যের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল তেলিঙ্গনা রাজ্য। বরঙ্গল ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। কাকতীয় বংশের দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন তেলিঙ্গনার রাজা। মালিক কাফুর বরঙ্গল আক্রমণ করলে প্রতাপরুদ্রদেব অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাঁকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। কাফুরের সাথে তাঁর সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তানুসারে তিনি সুলতানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁকে বার্ষিক করপ্রদানে রাজী হন। ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর বিজয়গৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

দ্বার সমুদ্র অভিযান

অত্যন্ত সহজে তেলিঙ্গনারাজকে পরাজিত করতে পেরে আলাউদ্দীনের উচ্চাশা আরও বেড়ে যায়। তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত জয় করার সংকল্প নেন। এই উদ্দেশ্যে ১৩১০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি মালিক কাফুরকে তৃতীয়বারের মতো দাক্ষিণাত্যে পাঠান। মালিক কাফুর যাদবরাজ্য ও তেলিঙ্গনা পার হয়ে দ্বারসমুদ্রে এসে উপস্থিত হন। দ্বারসমুদ্রের রাজা ছিলেন তৃতীয় বীর বল্লাল। সামান্য বাধা দানের পর বীর বল্লাল সুলতানের আনুগত্য মেনে নেন এবং কর প্রদানে রাজী হন।

পান্ডরাজ্য অভিযান

দ্বারসমুদ্র পদানত করে মালিক কাফুর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন। দ্বারসমুদ্রের দক্ষিণে তখন ছিল পান্ড্য রাজ্য। মাদুরা ছিল এ রাজ্যের রাজধানী শহর। ভূতপূর্ব রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর দুই পুত্র বীর পান্ড্য ও সুন্ড পান্ড্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে পান্ড্য রাজ্য এমনিতেই ছিল দুর্বল। কাফুরকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি এ রাজ্যের ছিল না। কাফুরের আগমনে বীর পান্ড্য রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। মাদুরা কাফুরের দখলে আসে। তিনি প্রচুর ধনরত্নসহ ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

পুনরায় দেবগিরি অভিযান

যাদব রাজ্যের রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র শংকরদেব দেবগিরির সিংহাসনে বসেন। তিনি আলাউদ্দীনকে পিতার প্রতিশ্রুত কর দিতে অস্বীকার করেন। এতে আলাউদ্দীন অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি মালিক কাফুরকে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। এটি ছিল দাক্ষিণাত্যে মালিক কাফুরের চতুর্থ অভিযান। ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করেন। শংকরদেব প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে তিনি পাহাড়-জংগলে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। দিল্লী বাহিনী তাঁর সন্ধানে সমগ্র রাজ্য তছনছ করতে থাকে। অবশেষে তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। সফল অভিযান শেষে কাফুর প্রচুর ধনরত্নসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফলাফল

১৩০৬ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত ৭ বছরের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী দাক্ষিণাত্যে ৪টি অভিযান পাঠান। অভিযানগুলো ছিল সুপরিকল্পিত। প্রতিটি অভিযান সফল হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রায় শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুসলিম দাপট অনুভূত হয়। সুলতানের গৌরব হয় আকাশচুম্বী। তাঁর 'সিকান্দর-ই-সানী' বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি সার্থক হয়। তিনি যশোগৌরবের সাথে সাথে প্রচুর সম্পদেরও মালিক হন। সুলতান ছিলেন বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী। সে যুগের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরত্বের কারণে সরাসরি দাক্ষিণাত্য শাসন করা সম্ভব ছিলনা। তাই এগুলোকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এগুলোর মৌখিক আনুগত্য ও বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতিতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। পরাজিত রাজাগণকে তিনি তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের শাসনক্ষমতায় বহাল রাখেন। শক্তির দাপটে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে হাত দেন নি।

১৩০৬ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত ৭ বছরের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী দাক্ষিণাত্যে ৪টি অভিযান পাঠান

একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাদুরা জয় করেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন

সার-সংক্ষেপ

আলাউদ্দীন খলজী দাক্ষিণাত্য জয় করেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানে নেতৃত্ব দেন সুলতানের সেনাপতি মালিক কাফুর। ১৩০৬ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত মালিক কাফুর ৪টি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাদুরা জয় করেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। দক্ষিণ-ভারত থেকে মালিক কাফুর প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। দক্ষিণ-ভারত জয়ের ফলে সুলতানের গৌরব বৃদ্ধি পায়। তিনি দক্ষিণ-ভারতের বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনের দায়িত্ব ঐ সকল রাজ্যের রাজাদের হাতেই ছেড়ে দেন। সুলতানের প্রতি তাঁরা অনুগত থাকতেন এবং সুলতানকে বার্ষিক কর দিতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দাক্ষিণাত্য বিজয়ে আলাউদ্দীনের সেনাপতি ছিলেন–
   ক. নসরত খান।
   খ. উলুঘ খান।
   গ. জাফর খান।
   ঘ. মালিক কাফুর।

২। দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব রাজা ছিলেন–

ক. যাদব বংশের।
খ. কাকতীয় বংশের।
গ. পান্ড্য বংশের।
ঘ. চন্দ্রবংশের।

৩। মালিক কাফুর যখন দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করেন তখন সেখানকার রাজা ছিলেন–
ক. বীর বল্লাল।
খ. প্রতাপরুদ্রদেব।
গ. বীর পাণ্ড্য।
ঘ. শংকরদেব।

৪। দক্ষিণ-ভারত জয়ের পর এ অঞ্চলের রাজ্যগুলো সম্পর্কে আলাউদ্দীন খলজীর নীতি–
ক. সরাসরি নিজ শাসনাধীনে আনেন।
খ. তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।
গ. এগুলোকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন।
ঘ. এ সকল রাজ্যের রাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করেন।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
২. আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্যে যে ৪টি অভিযান পাঠান তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ ৫

আলাউদ্দীন খলজীর শাসন সংস্কার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আলাউদ্দীন খলজীর শাসনব্যবস্থার মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- তাঁর রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে করবেন।
- তাঁর সামরিক সংস্কারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শাসক হিসেবে আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

শাসন সংস্কার

নিজ বাহুবলে আলাউদ্দীন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করার ব্যবস্থা করেন। বিজেতা আলাউদ্দীন অবশ্যই খ্যাতিমান। তবে শাসক হিসেবে আলাউদ্দীন আরও বেশি খ্যাতির অধিকারী। ভারতীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজীই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। শাসন বিষয়ে তিনি ওলেমাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। কাজী মুঘিসউদ্দীনকে একবার আলাউদ্দীন খলজী বলেন, "I do not know whether this is lawful or unlawful, whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency that I decree." অর্থাৎ যা তিনি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কিংবা জরুরি অবস্থার জন্য উপযোগী মনে করেছেন তদনুসারে তিনি আদেশ জারী করেছেন, তা আইন সংগত কি বে-আইনী সে বিবেচনায় তিনি যেতেন না। আলাউদ্দীন ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক। তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। তবে তিনি প্রজাহিতৈষী সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল প্রজার কল্যাণ সাধন। শাসনকাজে তাঁর মতো দক্ষতা অপরাপর অনেক শাসকই দেখাতে পারেন নি। পরবর্তীকালে শেরশাহ ও আকবর তাঁর শাসননীতির বিভিন্ন দিক তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করেন।

আলাউদ্দীন ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক। তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। তবে তিনি প্রজাহিতৈষী সুলতান ছিলেন

আলাউদ্দীন খলজী শাসনক্ষমতায় আসার আগে অভিজাত ও আমীরগণ ঘনঘন বিদ্রোহ করতেন। তিনি এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিদ্রোহের পেছনে চারটি কারণ কাজ করে ঃ

(১) শাসন বিষয়ে সুলতানের অমনোযোগিতা।
(২) আমীরদের পারস্পরিক আত্মীয়তা ও সামাজিক মেলামেশা।
(৩) মদ্যপান এবং
(৪) সম্পদের প্রাচুর্য।

কারণ উদ্ঘাটনের পর সুলতান বিদ্রোহ নিরসনের উপায় উদ্ভাবন করলেন।

শাসন বিষয়ে সুলতানের অমনোযোগিতা আলাউদ্দীন দূর করেন নিজের দৃঢ় সংকল্প দ্বারা। তিনি শাসন বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা শুরু করেন। শাসনের খুঁটি-নাটিও সুলতানের নজর এড়াতো না

প্রথম কারণ অর্থাৎ শাসন বিষয়ে সুলতানের অমনোযোগিতা আলাউদ্দীন দূর করেন নিজের দৃঢ় সংকল্প দ্বারা। তিনি শাসন বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা শুরু করেন। শাসনের খুঁটি-নাটিও সুলতানের নজর এড়াতো না। খাসমহলে কিংবা দরবারে নৃত্য-গীত কিংবা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সুলতান কমিয়ে দেন। এভাবে শাসন বিষয়ে সুলতানের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সুলতান আইন করে দিলেন যে আমীরদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তা, পারিবারিক সংযোগ কিংবা সামাজিক বৈঠক করতে হলে পূর্বাহ্নে সুলতানের অনুমতি নিতে হবে। তিনি দেশে কঠোর গুপ্তচরপ্রথা প্রবর্তন করলেন। গ্রপ্তচরের ভয়ে আমীরগণ অনুমতিপ্রাপ্ত বৈঠকেও মুখ খুলতে সাহস পেতেন না। সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিংবা ষড়যন্ত্র করার প্রবণতা বন্ধ হলো।

তৃতীয়ত, সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যে মদ কেনা-বেচা কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। গোপনে মদ কেনা-বেচা চলে কিনা তা দেখার জন্য গুপ্তচরেরা সদা প্রস্তুত ছিল। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সুলতান নিজেও মদ পানের অভ্যাস ছেড়ে দিলেন এবং পানপাত্রগুলো ভেংগে ফেললেন।

চতুর্থত, রাজ্যমধ্যে যারা অত্যন্ত সম্পদশালী তাদের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। মানুষের সম্পদ কমে যাওয়ায় তারা আর বিদ্রোহ করার কিংবা অশান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ পেলো না। আলাউদ্দীন খলজী সম্পদশালী হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় হিন্দুগণ বিদ্রোহ করার কথা বলতে গেলে আর ভাবতেও পারেনি। জিয়াউদ্দীন বারণী হলেন, "চৌধুরী, খুত ও মুকাদ্দমগণ ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র রাখা, মিহিকাপড় পরা এবং পান খাওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।" তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হতো।

রাজস্ব সংস্কার

রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর জন্য আলাউদ্দীন খলজী রাজস্ব সংস্কার করেন। অভিজাত, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতিকে যে সকল ভূ-সম্পত্তি দানস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল তা তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। সুলতানের নির্দেশে অপ্রয়োজনীয় বৃত্তি, ভাতা ও জায়গীর বন্ধ করা হয়। কোন কোন লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করা হচ্ছিল। সুলতান এ সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এগুলোর উপর কর আরোপ করেন। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল খারাজ, যাকাৎ, জিজিয়া, খুম্‌স ইত্যাদি। ভূমির উপর আরোপিত করের নাম 'খারাজ'। জমির উর্বরতা অনুসারে খারাজের তারতম্য হতো। দোয়াব প্রভৃতি উর্বর অঞ্চলের ভূমিকর নির্ধারিত হয় উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। জমি জরিপ করে খাজনা ধার্য করার ব্যবস্থা করা হয় মুসলমানগণকে আয়ের $২\frac{১}{২}\%$ যাকাৎ দিতে হতো। সুস্থ, সবল ও প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যুদ্ধক্ষম অমুসলমান পুরুষ প্রজাদের উপর 'জিজিয়া' নামক কর আরোপিত ছিল। নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও পুরোহিতগণ অবশ্য জিজিয়া কর প্রদান করা থেকে মুক্ত ছিল। যুদ্ধলুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{৫}$ অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। একে বলা হতো 'খুমুস'। রাষ্ট্রীয় কর দেওয়ার ব্যাপারে কেউ ফাঁকি দিতে পারতো না। সুলতানের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পূর্ণ ছিল। ভূমির বদলে রাজকর্মচারীদের নগদ বেতন দেওয়া হতো।

সামরিক সংস্কার

আলাউদ্দীন খলজী সামরিক বিভাগেও সংস্কার সাধন করেন। তিনি এক বিশাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সৈন্যদের নগদ বেতন দেওয়া হতো। তিনি সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেন। তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণী বা রেজিস্টার রাখার প্রথা চালু করেন। সৈন্যগণ যাতে রাষ্ট্রীয় ঘোড়া বিক্রয় করে তদস্থলে নিম্নমানের ঘোড়া দেখাতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ঘোড়ার গায়ে 'দাগ' দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আলাউদ্দীন খলজী মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেঁধে দেওয়া হয়। কোন বিক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের অধিক দাম চাইলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। ওজনে কম দিলেও বিক্রেতাকে কঠোর সাজা পেতে হতো। এক কথায় আলাউদ্দীন খলজী শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

আলাউদ্দীন স্বৈরাচারী সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল প্রজার কল্যাণ সাধন। তিনি আমীর ও অভিজাতদের বিদ্রোহের মূল কারণগুলো দূর করেন। তিনি রাজস্ব বিভাগ ও সামরিক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তিনি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালের শাসকগণও তাঁর শাসনরীতি অনুসরণ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন–
ক. কুতুবউদ্দীন আইবক।
খ. শামসউদ্দীন ইলতুতমিস।
গ. গিয়াসউদ্দীন বলবন।
ঘ. আলাউদ্দীন খলজী।

২। আলাউদ্দীন খলজী রাজস্ব সংস্কার করেন–
ক. রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর জন্য।
খ. আমীরদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য।
গ. হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য।
ঘ. বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখার জন্য।

৩। 'জিজিয়া' কর দিতে হতো–
ক. সকল অমুসলমান রাজাদের।
খ. যুদ্ধক্ষম অমুসলমান পুরুষ প্রজাদের।
গ. সকল প্রজাদের।
ঘ. সকল অমুসলমানদের।

৪। 'খুমস' বলতে বুঝায়–
ক. যুদ্ধ-লুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ।
খ. যুদ্ধ-লুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{২}$ অংশ।
গ. যুদ্ধ-লুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{৫}$ অংশ।
ঘ. যুদ্ধ-লুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{৪}$ অংশ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দীন খলজীর শাসনব্যবস্থার মূলনীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. আলাউদ্দীন খলজীর রাজস্ব সংস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩. আলাউদ্দীন খলজীর সামরিক সংস্কারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ ৬

আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তিনি পণ্যের বাজার কিভাবে বিন্যস্ত করেন তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তাঁর বেঁধে দেওয়া বাজার দর সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আলাউদ্দীন খলজীর গৃহীত ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারের আওতায় একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং রাজ্যবিস্তারের জন্য তাঁর এ বাহিনীর দরকার ছিল। অথচ দেশে ছিল তখন মুদ্রাস্ফীতি। দক্ষিণ-ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ উত্তর ভারতে আনার কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। জিনিসপত্রের দর ছিল চড়া। সুতরাং সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে সৈন্যগণ যে বেতন পেতো তা দিয়ে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারতো না। সুলতান তাই একটা অভিনব পথ খুঁজে বের করলেন যাতে বেতনের টাকায় তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে পারে। তিনি জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিলেন। খরচ না বাড়িয়ে যাতে তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী পুষতে পারেন মূলত: সে প্রয়োজনেই করা হয় এ ব্যবস্থা গ্রহণ। তাঁর এ ব্যবস্থা 'মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। আধুনিককালে সাধারণত যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধপরবর্তী জরুরি অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া হয়। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করণ ও রাজ্যজয়ের জন্য আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রায় গোটাটাই জরুরি অবস্থার ভেতর দিয়ে কেটেছে। আলাউদ্দীন তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই এ মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এ মৌলিক পন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্টেনলী লেনপুল সুলতানকে একজন মহান রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ বলেছেন।

আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারের আওতায় একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুলতানের একটা উক্তি জিয়াউদ্দীন বারণী তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্তিটা এরকম: "আমি যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক বাহিনীর বেতন বাবদ বরাদ্দ করি এবং একই হারে সর্বত্র বেতন দেয়ার রেওয়াজ বজায় রাখতে চাই, তাহলে বর্তমানে সরকারী মালখানা পূর্ণ থাকলেও পাঁচ-ছয় বছরে তা শেষ হয়ে যাবে।" এ উক্তিটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সৈনিক ও অন্যান্য কর্মচারিদের একটা বিধিবদ্ধ হারে বেতন দেয়া হতো। সুলতানের কোষাগার পূর্ণ ছিল। তিনি টাকার অভাবের জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দূরদর্শী সুলতান এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

সুলতানের কোষাগার পূর্ণ ছিল। তিনি টাকার অভাবের জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দূরদর্শী সুলতান এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন

পণ্যের বাজার বিন্যাস

সুলতান পণ্যের বাজার তিনভাগে ভাগ করেন ঃ

১. চাল, ডাল, তেল, নুন প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের বাজার।

২. দাস-দাসী, গরু, মোষ, ঘোড়া প্রভৃতির বাজার।

৩. কাপড়-চোপড় প্রভৃতির বাজার।

বাজার তদারকি ব্যবস্থা

বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'শাহানা-ই-মন্ডি' ও 'দিওয়ান-ই-রিয়াসত' নামক দুজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। শাহানা-ই-মন্ডি শস্য ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারক করতেন। দিওয়ান-ই-রিয়াসত কাপড়-চোপড়, ভৃত্য, পশু ইত্যাদির বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন। শাহানা ও দিওয়ানের অধীনে নিম্নপদস্থ আরও অনেক কর্মচারি ছিল। বাজারে পণ্যের সরবরাহ নিয়মিত করা, বাজারদর তদারক করা, ওজন ইত্যাদি পরীক্ষা করা ছিল তাদের কর্তব্য। ব্যবসায়ীগণ যাতে নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দাবি না করে, ওজনে কম না দেয়, বাজার থেকে ভোগ্য পণ্য উধাও করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করে সেদিকে তাদের সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হতো। গুপ্তচরেরা কর্মচারি ও ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ জেনে সুলতানের গোচরে আনতো।

পন্যের মূল্যমান নির্ধারণ

সুলতান বিভিন্ন আদেশ জারী করে জিনিসপত্রের দাম নিম্নোক্তভাবে বেঁধে দেন ঃ

পণ্য	পরিমাণ	দর
গম	১ মণ	$৭\frac{১}{২}$ জিতল
ধান	১ মণ	৫ জিতল
ডাল	১ মণ	৫ জিতল
লবন	২.৫ মণ	৫ জিতল
চিনি	১ সের	১.৫ জিতল
গুড়	১ সের	.২৫ জিতল
ঘি	২.৫ সের	১ জিতল
তেল	৩ সের	১ জিতল

এরূপভাবে শাকসব্জী, টুপি, জুতা ইত্যাদি থেকে শুরু করে গরু, মোষ, ঘোড়া, দাস-দাসী ইত্যাদির দাম বেঁধে দেয়া হয়েছিল। একটা দুধেল গাভীর দাম ৪ টাকা এবং একটা উন্নত মানের ঘোড়ার দাম ১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হতো। এর ব্যতিক্রম ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সরবরাহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পদক্ষেপ

আলাউদ্দীন খলজী পণ্য সরবরাহের উপর জোর দিয়েছিলেন। এজন্য বিভিন্ন স্থানে রাজকীয় শস্যাগার স্থাপন করা হয়। এগুলোতে শস্য জমা করা হতো এবং প্রয়োজনমতো রাজধানীতে সরবরাহ করা হতো। দিল্লীর আশ-পাশের গ্রামগুলো থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো। এগুলো জমা করা হতো দিল্লীর রাষ্ট্রীয় শস্যাগারে । কৃষকগণ দশমণের বেশি শস্য রাখতে পারতোনা। বদাউন তোরণের ভেতর অবস্থিত 'সর-ই-আদল' নামক বাজারে সকল রকম পণ্য বিক্রি হতো। ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হতো। তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীগণ ছাড়া আর কেউ পণ্য বিক্রি করতে পারতো না। ওজনে কম দিলে বিক্রেতার শরীর থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেয়া হতো।

ওজনে কম দিলে বিক্রেতার শরীর থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেয়া হতো

ফলাফল

আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। অভাবের সময়ও জনসাধারণ উচ্চমূল্যের চাপ অনুভব করেনি। অভাবের সময় খাদ্যশস্যের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ (ৎধঃরড়হরহম) নির্ধারণ করা হতো। সে সময় একজন ব্যক্তির কাছে আধ মণের বেশি শস্য বিক্রি করা হতো না। লেনপুল মনে করেন কর্মচারী ও সৈন্যদের সাথে সাথে জনসাধারণও সুলতানের মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন বারণীর মতে, বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য ছিল যুগের বিস্ময়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধু রাজধানী দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি তাও হয় তাহলেও রাজধানীর প্রভাব সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও পড়া স্বাভাবিক।

আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল

সার-সংক্ষেপ

আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর অর্থ উত্তর ভারতে আসে। এতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। আলাউদ্দীন খলজীর এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তিনি যাতে কম খরচে এই সৈন্যবাহিনী পুষতে পারেন সেজন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর বেঁধে দেন। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেন। কর্মচারীগণ বাজার তদারক করতো। তদারকি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য গুপ্তচর ছিল। বিক্রেতাগণ ওজনে কম দিলে এবং ধার্যকৃত দরের অধিক দাবি করলে কঠোর শাস্তি পেতো। অভাবের সময় ক্রেতাগণ নিয়ন্ত্রিত হারে শস্য কিনতে পারতো। কোন পণ্য অবৈধভাবে গুদামজাত করা যেতো না। আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়–
ক. মোঙ্গল আক্রমণের জন্য।
খ. বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য।
গ. দক্ষিণ ভারত থেকে বিপুল ধন রত্ন উত্তর ভারতে আনার জন্য।
ঘ. উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য।

২। লেনপুল আলাউদ্দীনকে আখ্যায়িত করেন–
ক. মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ।
খ. মহান রাজনীতিক।
গ. মহান অর্থনীতিবিদ।
ঘ. মহান বিজেতা।

৩। সুলতান পণ্যের বাজার ভাগ করেন–
ক. দুই ভাগে।
খ. তিন ভাগে।
গ. চার ভাগে।
ঘ. পাচঁ ভাগে।

৪। ওজনে কম দিলে বিক্রেতাকে শাস্তি দেয়া হতো–
ক. মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো।
খ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হতো।
গ. হাত কেটে ফেলা হতো।
ঘ. বিক্রেতার শরীর থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেয়া হতো।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দীন খলজী পণ্যের বাজার যেভাবে বিন্যস্ত করেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক বেঁধে দেয়া বাজার দর সম্পর্কে সংক্ষেপ লিখুন।
৩. পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১০ : রচনা মূলক প্রশ্ন

১. জালালউদ্দীনের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বর্ণনা করুন।
২. কিভাবে আলাউদ্দীন খলজী তাঁর শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন, সে সম্পর্কে বিবরণ দিন।
৩. আলাউদ্দীন খলজীর উত্তর-ভারত বিজয়ের ঘটনাবলী আলোচনা করুন।
৪. আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের দক্ষিণ ভারত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিন।
৫. আলাউদ্দীনের শাসন সংস্কারের বিবরণ দিন।
৬. আলাউদ্দীন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১০.১	ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. গ	৪. খ
পাঠ ১০.২	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ১০.৩	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ১০.৪	ঃ	১. ঘ	২. খ	৩. ক	৪. গ
পাঠ ১০.৫	ঃ	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. গ
পাঠ ১০.৬	ঃ	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ